চাউল

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

মানভূমের ঢাঁড় ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড় পাহাড়শ্রেণী, অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুল বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, নাকটিটাঁড়ের উঁচু ডাঙা জমিথেকে যতদূর দেখা যায়, শুধু রক্তপলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েছে।

জঙ্গল দেখতে এসেচি এদিকে, কাছেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তে ডাকবাংলোতে থাকি, জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তাই দেখে বেড়াই। একদিন সন্ধের আগে নাকটিটাঁড়ের বন দেখে ফিরচি, পথের ধারে একটা হরীতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোট মেয়েবসে পুঁটুলি খুলে কি খাচ্ছে। জনহীন পথিপার্শ্ব, কেউ কোনোদিকে নেই—সন্ধেরও আর অল্পই বিলম্ব, সামনে বাঘমুণ্ডীর বনময় পথ, এমন সময়ে লোকটা কি করে জানবার আগ্রহে ওর দিকেএগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু পাকা, কিছুকাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খানদুই ছেঁড়া নেকড়া, একখানা কাঁথা আর কিছু মকাই—সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুটের টিন। বোধ হয় সেটাই তৈজসপত্রের অভাব পূর্ণ করচে সবদিক দিয়ে। সঙ্গের মেয়েটির বয়েস চার কি পাঁচ। পরনে ছোট্ট একটু ময়লা নেকড়া মেয়েটার, কোমরে ঘুনসি।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে হে, বাড়ি কোথায়?"

লোকটি মানভূমি বাংলায় বললে, "তোড়াং হে...টুকুআগুন আছে?"

"দেশলাই? আছে, দিচ্ছি।...তোড়াং কতদূর এখান থেকে?"

"টুকু দূর আছে বটে। পাঁচ কোশ হবেক।"

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে এমন সন্ধেবেলা?"

"হেই সেই পুরুলিয়া থিকে।...আগুন দাও বাবু। শোরিল এক্কেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার মা মরে গেল ওর দু'বছর বয়সে। ওকে রেখে জঙ্গলে কাঠের দাম করতে যাইতে পারি নাই—তাই পুরুলিয়া গেইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দু'বছর রঁইয়েছিলি।"

লোকটির কথাবার্তার ধরন আমাকে আকৃষ্ট করলে। ডাক-বাংলোতে সন্ধ্যার সময়ে ফিরেই বা কি হবে এখন? সেখানেও সঙ্গীহীন ঘর-দোর। তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক্ এর সঙ্গে। কাছে একটা বড় পাথর পড়েছিল, সেটার ওপর বসে ওকে একটা বিড়ি দিলাম, নিজেওএকটা ধরালাম। লোকটার বাড়ি নাকি পাঁচ-ছ'ক্রোশ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র বন্য গ্রামে, বাঘমুণ্ডী ওঝালদা শৈলমালা ও অরণ্যের মধ্যবর্তী কোনো নিভৃত ছায়াগহন উপত্যকাভূমিতে—পলাশ, মহুয়া, বট, কেঁদ গাছের তলায়। ওর আর দুটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পরে এই মেয়েটি হয় এবং মেয়েটির বয়স যখন দু'বছর, তখন ওর মাও হ'ল মৃত্যুপথযাত্রী। লোকটা জঙ্গলের কাঠভেঙে এনে চন্দনকিয়ারীর হাটে বিক্রি করতো এদেশের অনেক গ্রাম্যলোকের মতো। কিন্তু ঘরেকেউ নেই দু'বছরের মেয়েকে দেখবার, তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পাহাড়ে উঠে রৌদ্র ও বর্ষায় কিকরে কাঠ ভাঙে? তাই ঘরের আগড় বন্ধ করে ও চলে গিয়েছিল অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় পুরুলিয়া শহরে।

আমি বললাম, "কাঠের কাজে আয় হত কেমন?"।

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে বললে, "বোঝা পিছু তিন আনা, চার আনা। জঙ্গলে ছাড়লিত দু'পয়সা। চাল ছস্তা ছিলি। হঁইয়ে যেতো পেটের ভাত দু'জনার। তারপর বাবু মেয়্যাটাহোলেক্, ওর মা মর‍্যা গেলেক্। তখন কচি মেয়্যোটারে ফেলে জঙ্গলে যেতে মন নাই সরলেক্।বলি যাই পুরুলিয়া, ভারি শহর, পেটের ভাত দু'জনার হইয়ে যাবেক্।"

"পুরুলিয়া বড় জায়গা?"

"ওঃ, বাবু, ইধার থিকে উধার যাওয়ার কূল-কিনারা দু'বছরে নাই পাইলেক্। ভারি শহর বাবু..."

আমি ওকে আর একটা বিড়ি দিলাম। গল্প জমে উঠেছে। বললাম,—"তারপর...?"

তারপর পুরুলিয়া শহরে কিভাবে গেল, তার গল্প করলে। ওদের পাশের গাঁয়ের একজন লোক পুরুলিয়া শহরে কি একটা কাজ করে, তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়েছে, তখন এক বড়লোকের বাড়ির ফটকে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতেদাঁড়াল। তারা দু'টি পয়সা দিলে, দু'পয়সার ছোলা কিনে বাপ-মেয়েতে রাত কাটিয়ে দিলেগাছতলায় শুয়ে। পুলিশে আবার শুতে দেয় না; অর্ধেক রাত্রে এসে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে, "হিঁয়াসে হঠ যাও!" তার পরদিন আলাপী লোকের সন্ধান মিলল। গিয়ে দেখে দেশেসে লোকটা যত বড়াই করে, আসলে সে তত বড় নয়। সামান্য একটা দু-কামরা ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকে—তামাক মেখে বিক্রি করে মাথায় নিয়ে, কখনো জলের কুঁজো পাইকেরি দরে কিনে ফিরি করে খুচরো বেচে—এই সব উঞ্ছবৃত্তি। অথচ দেশে বলেছিল সে বড়সাহেবের আরদালি।

যাহোক্, অনেক বলা-কওয়াতে সে জায়গা একটু দিলে—ঘরের বাইরের দাওয়ার একপাশে শুয়ে থাকতে হবে, তবে নিজের এনে খাওয়া-দাওয়া, তার ভার সে নেবে না। বছর দুই সেখানেই থেকে চলেছিল যা হয় একরকম—তারপর এই অকাল পড়ল, চালের দাম চড়ল—শহরে চালের দাম হ'ল আঠারো টাকা। ভিক্ষে আর তেমন লোকে দিতে চায় না—তাওহয়তো চলতো যা হয় করে, কিন্তু যাদের বাড়িতে থাকা তারা গোলমাল করতে লাগল। তারাআর জায়গা দিতে চায় না, বলে, "আমাদের লোক আসবে, বাড়ি ছেড়ে দাও।" রোজ গোলমাল করে, তাই আজ তিন দিন শহর থেকে বেরিয়ে জন্মভূমি তোড়াং গ্রামে চলেচে।

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ খালি বিস্কুটের টিন হাতে করে বাজাচ্ছিল।

ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা বললে, "এর নাম রৈঁখেছে থুপী।" আমি বাপের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম, "থুপী? বেশ নাম!"

বাপ সগর্বে বললে, "হাঁ, থুপী।" তারপর আমায় বললে, "বাবু, তামাক কিনবার পয়সা দিবেন দুটি ?"

আমি পয়সা সামান্যই নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচি, জঙ্গলের পথে পয়সা কি করব? ওকেদু'টি মাত্র পয়সা দিতে পারলাম। থুপী কি একটা বললে ওর বাবাকে, বাবা তাকে কাঁধে নিয়ে চলল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—

রাস্তা যেখানে উঁচু হয়ে ওদিকের সব দৃশ্য ঢেকে দিয়েচে, সেখানে ওর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে পুঁটুলি বগলে ও চলেচে—সেদিকেই অস্তদিগন্ত ও সূর্যাস্ত, রঙীন আকাশের পটে ওর মূর্তি দেখাচ্ছে ছবির মতো, কারণ আগেই বলেছি রাস্তা উঁচু হওয়ার দরুনসেখানে আর কিছু দেখা যায় না, রাস্তাই সেখানে চক্রবালরেখার সৃষ্টি করেছে।

মনে মনে ভাবলাম, ওর কোথাও অন্ন নেই, গৃহ নেই—পাঁচ বছরের মেয়েকে কত স্নেহে কাঁধে তুলে ও যে চলল গ্রামের দিকে, সেখানে অন্ন কি জুটবে এ দুর্দিনে,যদি পুরুলিয়া শহরেনা জুটে থাকে? কোন বৃথা আশার আকর্ষণ ওকে নিয়ে চলেচে গ্রামের মুখে ? তার পরেই সেঅদৃশ্য হয়ে গেল।...

এ হল গত মাসের কথা। তখনো চাল ছিল ষোলো টাকা আঠারো টাকা মণ, ক্রমে তাইদাঁড়াল বত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। এই সময় একবার কার্য উপলক্ষে বিহার থেকে আমায় যেতেহল বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়। মানুষের এমন কষ্ট কখনো চোখে দেখিনি—চোখেদেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে।

যে আত্মীয়ের বাড়ি ছিলাম, তাদের বাড়িতে সন্ধ্যা থেকে কত রাত পর্যন্ত শীর্ণ, বুভুক্ষু, কঙ্কালসার বালকবালিকা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় কালো হাঁড়ি উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলচে,—"একটু ফেনদিন না, একটু ফেন!.." অনাহারে মৃত্যুর কত মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে এলাম সারা পথ কুমিল্লা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত—স্টিমারে, ট্রেনে।

বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই। বহেরাগোড়া স্কুলের বোর্ডিঙে ড্রেন দিয়ে যে ভাতেরফেন গড়িয়ে পড়ে তাই ধরে খাবার জন্যে একপাল বুভুক্ষু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতেদু'বেলা বসে থাকে—তারই জন্যে কি কাড়াকাড়ি!

হেডমাস্টার বললেন, "এই গ্রামের ডোম আর কাহারদের ছেলেমেয়ে এখানেই পড়ে আছে ভাতের ফেনের জন্যে—সকাল থেকে এসে জোটে আর সারাদিন থাকে, রাত ন'টা পর্যন্ত। সামান্য দুটো ভাতের জন্যে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে!"

পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্মের খাবারের দোকানে খাবার পেয়ে পাতা ফেলেদিয়েচে লোকে—তাই চেটে চেটে খাচ্ছে উলঙ্গ, কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেরা – অথচ সেপাতায় কিছুই নেই, কি চাটছে তারাই জানে!

এই অবস্থার মধ্যে ভাদ্রমাসের শেষে আমি এলাম এমন একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক খাটচে একজন বড় কন্ট্রাক্টরের অধীনে, ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানো কাজে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে এরা টাটায় চালান দিচ্ছে, স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে নতুন ইজারা নেওয়া পাথর খাদান।

একদিন সেখানকার ছোট্ট ডাক্তারখানাটার সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারখানাটার সংকীর্ণ বারান্দাতে একজন কুলি শুয়ে আছে। পিঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা— ব্যান্ডেজ ভিজে গিয়ে রক্ত দরদরিয়ে পড়ে সিমেন্টের রোয়াক ভিজিয়ে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েচে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এমন মাঝে মাঝে এক-আধটা হচ্ছেই। ব্লাস্টিং করতে গিয়েপাথর ছুটে লেগে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সেলাই করে দিয়েছি, এখন টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—অ্যাম্বুলেন্স আসচে।"

ভিড় একটু সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটা পাঁচ-ছ বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরেবসে—কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না—নির্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

আমি তাকে দেখেই চিনলাম—আটমাস পূর্বে মানভূমের বন্য অঞ্চলে দৃষ্ট সেই ক্ষুদ্রবালিকা থুপী!

আহত কুলির মুখ ভাল করে দেখে চিনলাম—এ সেই থুপীর বাবা, যে সগর্বে বলেছিল, "এর নাম রেখেচি থুপী।"

আশপাশের দু-একজনকে জিগ্যেস করলাম, "এ কোথা থেকে এসেছিল জানো?"

একজন বললে, "মানভূম জিলা থেকে আজ্ঞে।"

"কি গাঁ?"

"তোড়াং।"

"ওর কোনো আপনার লোক এখানে নেই?"

"কে থাকবেক্ আজ্ঞে—ওর ওই বিটি ছানাটা আছে। কত কত ধুর থিক্যা এখেনে কাজ করতে এসেচে, চাল দেয় সেই জন্যে আজ্ঞে।"

"কোম্পানি কত করে চাল দেয়?"

"হপ্তায় পাঁচ সের মাথাপিছু।"

সুতরাং থুপীর বাপের ইতিহাস আমি অনেকটা অনুমান করে নিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ি ভেঙেচুরে গিয়েচে, চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থ্যের বাইরের জিনিস তা কেনা। মকাই ও বিরি কলাই, তারপরে বুনো কচু ও ভুঁই-কুমড়োর মূল খেয়ে যতদিন চলবার চলল—কারণ ঠিক এই ইতিহাস আমি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে আগত প্রত্যেক কুলির মুখেই শুনেচি—শেষে এখানে ও এসে পড়ল মজুরি, বিশেষ করে চাল পাওয়ার লোভে। পয়সা দিলেও গ্রামে আজকাল চাল মিলছে না, আমি সেদিন বহেরাগোড়া অঞ্চলে দেখে এসেছি।

অ্যাম্বুলেন্স্ গাড়ি এল। ধরাধরি করে থুপীর বাবাকে গাড়িতে ওঠানো হল—সে কেবলমাত্র একবার যন্ত্রণাসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া অত আদরের অত গর্বের বস্তু থুপীর নামও করলে না, তার দিকে ফিরেও চাইলে না!

ডাক্তার বললেন, "টাটা এখান থেকে সাতাশ মাইল রাস্তা। ঝাঁকুনিতেই বোধ হয় মারা যাবে—বিশেষ করে রক্ত বন্ধ হল না যখন এখনো।"

দু'ধারের শালবনের মধ্যবর্তী রাঙা মরুম মাটির সোজা রাস্তা বেয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মোটর ছুটল থুপীর বাবাকে নিয়ে পুনরায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে, পুনরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ্য করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অত সাধের অনাথা থুপীকে কার কাছে রেখে চলল, সে হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।